Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.56-63
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নলিনী বেরার 'শবরচরিত' উপন্যাসে: লোকজ উপাদান

রিঙ্কু দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

Elements of both the modern novel and folk culture are taken from human society. So the relationship and conflict between these two is a matter of discussion. Various terms have been created for the word folklore. The use of folk culture in Bengali novels started with Bankimchandra, but the use of folk culture can be seen in the literature of Nalini Bera. The subject of folk culture is physical action, art, speech, practice, belief, ritual, history, ethnology, archeology, sociology, anthropology, linguistics, literature and art are involved. The folklore of the region Nalini Bera describes in her novel 'Shabrcharit' is the region along the banks of the 'Subarnarekha' river in the South-West border of Bengal, the confluence of Bengal-Bihar-Odisha known as 'Jungalmahal'. Mixed culture is seen in this region. In this narrative, the novelist has used the folk elements of this region folk tales, rhymes, riddles, proverbs, folksongs, folk language, legends etc. as raw material in this novel.

Keywords: Novel, Folk culture, Subarnarekha, Jungalmahal, Rhymes, Riddles, Proverbs, Folksongs.

নলিনী বেরার (১৯৫২-) বহুচর্চিত মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস 'শবরচরিত' (২০০৫)। উপন্যাসটি সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী ঝাড়গ্রাম জেলার অন্তর্গত নয়গ্রাম ও গোপীবল্লভপুর অঞ্চল নিয়ে রচিত। উপন্যাসে নিম্নোক্ত স্থানগুলি উঠে এসেছে – লবকিশোরপুর, বড়খাঁকড়িরহাট, ঘোড়াটাপুরজঙ্গল, তিলকমাটিহুড়ি, চামরবাঁধ, বড়শোল, ভালুকঘরিয়া, রুখনীমারা, দোরখুলি, নাকবিন্ধি, পাথরডহরা, নাদনাগাড়িয়া, পাতিনা, সিংধুয়ে, রাইবেনিয়া, গোবিন্দপুর, খোঁয়াড়, বেতুনটি, প্রতাপপুর, সদারবাঁধ, অমরদা, চিতবড়া, বাংধীপোষী, কয়ামাড়া, চাঁদাবিলা, বালিগেড়িয়া, কুলডিহা, উদলাখুঁটি, নারদা, খড়িয়া ও ধুমসাই। নলিনী বেরার ব্যবহৃত এই অঞ্চলটি প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য –

> "এই অঞ্চল সম্পর্কে আমার বিশ্বস্ত কোন ধারণা নেই। দেবেশ রায় 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে যেমন একটি মানচিত্র সন্নিবিষ্ট করেছিলেন, নলিনীরও উচিত ছিল এমন একটি মানচিত্র রাখা। তাতে পাঠকের সুবিধেই হত। তবে, বুঝতে পারছি মেদিনীপুরের একটি অঞ্চলকে তিনি আঞ্চলিক ভূ-খণ্ড বা উপন্যাসের স্থান পরিসর হিসেবে ব্যবহৃত করেছেন।"[১]

নলিনী বেরার 'শবরচরিত' শবরদের নিয়ে লেখা উপন্যাস। শবর দুইরকম – খেড়িয়া শবর ও লোধা শবর। লোধা শবরদের নিয়েই এই উপন্যাস। উপন্যাস জুড়ে রয়েছে শতাধিক চরিত্রের মহামিছিল। উপন্যাসে লেখকের বাস্তবতাবোধের সচেতনতা স্পষ্ট। বাস্তবতা ছড়িয়ে আছে ভৌগোলিক পরিবেশে, অধিবাসীজনের সংস্কার-বিশ্বাসে, লোকাচার-লোককথায়, ছড়া-ধাঁধায়, প্রবাদ-প্রবচনে, কিংবদন্তি-জনশ্রুতিতে। 'শবরচরিত' কোন অর্থই 'আঞ্চলিক' নয়। এই উপন্যাসের বিষয় নিয়ে ঔপন্যাসিক বলেন যে 'শবরচরিত' শুধুমাত্র লোধাশবরদের চরিতই নয়, সমস্ত অন্ত্যজ জঙলি মানুষদেরই চরিতমালা।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন অরণ্যাঞ্চলে বিভিন্ন উপজাতির মানুষ বাস করে। তাদের বিশ্বাস-জীবনযাত্রা-সভ্যতা সংস্কৃতি সবই আলাদা। কিন্তু শবররা আজ সবার থেকে স্বতন্ত্র। তাদের বোধ ও বিশ্বাসে নানা রকম পুরাণ প্রসঙ্গ মিশে আছে বলে নয় একমাত্র তারাই সময়টাকে আটকে রেখেছে। সভ্যতার এত অগ্রগতির পরেও শবরদের জীবনযাত্রায় তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। কৃষি সভ্যতা বিকাশের পূর্বের স্তরে, পূর্বের আদিম স্তরে পড়ে আছে তারা। শবরচরিত-ই শুধু একথা বলে না, বাস্তব পরিস্থিতিও তাই বলে। তারা খাদ্য সংগ্রাহক স্তরে আজও আছে। খাদ্য উৎপাদন করে না। বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করে তারা। এমনকী অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশুপালনও করে না। চাষবাস না শেখার কারণ হিসেবে যে কাহিনি লোধাদের মধ্যে প্রচলিত তা হল–

> "লোধাদের চাষবাস শিখাবে প্রথমে গরু-হাল দিল শিব ঠাকুর। দিয়ে বলল চাষবাস কর। জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈয়ারি করত, জঙ্গল কাটতে কাটতে শব্বরের খিদা-তেষ্টা পায়। কী খায়, কী খায়, ন হালের বলদটাকেই কেটে খেয়ে ফেলল। কি সে করে খাইল, ন, হাতির কানের তুল্য সেগুনপালহায়। সেই থিক্য জানবি সেগুনের ডগ ভাঙলেও রক্তের পারা রস গড়ায়। যাকে দিয়ে, চাষবাস করবি, তাকেই কি না কেটে খেয়ে ফেললি! হায় হায়রে বোকার জাত! রাগে কাঁই শিব ঠাকুর তেখন অভিশাপ দিল, বনেজঙ্গলেই ঘুরে ঘুরে মরবি তোরা, তোদের কপালে চাষবাস নাই।"[২]

উপন্যাসে দেখা যায় লোধা শবর জাতির মানুষ চাষ বাস জানে না, কিন্তু নামাল খাটতে এসে ধান কাটা ও ঝাড়ার অভিজ্ঞতা দেখিয়েছেন। ধান কাটা বিড়া-বাঁধা বাঁউক সাজানো শেষ করে বিড়ার বোঝা মাথায় নিয়ে লোধা বউড়ি ঝিউড়িরা ফিরে যায় গিরিহার খোলা-খামারে। হঠাৎ ধান নিয়ে ধানের বোঝা মাথায় নিয়ে ঝমর ঝমর চলতে চলতে একটা গীতের কথা গুরুভা বউয়ের মনে পড়ে যায় –

"ধান ধান ধানরাজা।
কিয় ধান বটে গো—
বাসমতী কমলিনী কয়া ধান বটে গো
বাসমতী কমলিনী কয়াধান বটে।"[৩]

গুরুভা গুড়কুঁদারা বিড়া পিটবার তক্তাটা আগে ঠিক করে নেয়। তক্তা তো নয়, কব্জা খোলা এক পাল্লা দরজার পাল্লা। দুধারে ধানের বিড়া বেঁধে বেঁধে উঁচু করা, তার উপর দরজার পাল্লা পাতা। পাল্লা যাতে গড়িয়ে না যায় তার জন্য ধানের বিড়া দিয়েই গিট-বাঁধা।

'শবরচরিত' উপন্যাস তাদের নিয়ে লেখা যারা 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-এ শবর, 'ঋগবেদ'-এ অসুর, 'অমরকোষ'-এ ম্লেচ্ছ, 'মৎস্যপুরাণ' ও 'বায়ুপুরাণ'-এ ক্ষত্রিয়। কুমোর, জেলে, মাহাতো, সাঁওতাল, লোধা

মিলে গড়ে ওঠে এক পরিচয়, এক অস্তিত্ব। যে অস্তিত্ব গড়ে ওঠে ভাষায়, উৎসবে, সংস্কৃতিতে। লোধাজীবন সংস্কার, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ পারিবারিক উৎসব সামাজিক পালাপার্বণ, পূজার্চনা, মেয়েলি ব্রত উৎসব এইগুলি গোষ্ঠীগীতের অন্তর্ভুক্ত। তেমনি প্রণয়-বিরহ, পারত্রিক চেতনা, ঈশ্বরের আত্ম-সম্পর্ক, সংসার জীবনের জন্য আত্মগ্লানি, দেহ-আত্মার সম্পর্ক নিরুপণ এগুলিও ব্যক্তি মানুষের গীতের অন্তর্ভুক্ত।

উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় কিংবদন্তি কাহিনি নিয়ে লোকগান। ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানার কিছু কিছু অংশ জুড়ে তপোবন জঙ্গলমহাল। তপোবনকে নিয়ে 'লোকগান' নলিনী বেরার উপন্যাসে পাওয়া যায় –

"রাম ছেড়েছেন যজ্ঞের ঘোড়া
তপোবনের কাননে
বাল্মীক তপোবনে –
লবকুশ ধরেছেন ঘোড়া হে
বিনা রণে নাই ছাড়েন।"[৪]

ছেলেরা দুটো লাইন করে মাঠের এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে, প্রত্যেকের হাতে প্রায় এক হাত লম্বা কাঠি। রাইবু বুঝল এবার 'কাঠিনাচ' হবে, নাচতেও শুরু করল। কাঠিতে কাঠিতে ঠোকাঠুকি, আর নাচ আর গান রাইবু শুনতে পাচ্ছে, বোকা গাইছে –

"উপরে সূরুযের আলো নিচে তাতা বালি।
চলিতে না পারেন সীতা করিছেন বিকলি।"[৫]

কাঠিনাচকে শুধু সীমান্ত বাঙলার মধ্যেই সীমায়িত করে রাখা যায় না। এই নাচটি কোন- না কোন রূপে সমগ্র ভারতবর্ষেই প্রচলিত। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, কাঠি নাচ সীমান্তবাঙলার বিশিষ্ট লোকনৃত্যের অন্যতম নয়, তবুও এর প্রচলন আধিক্য এই কথাই প্রমাণিত করে যে সমগ্র ভারতবর্ষে এই নাচের যেমন আদর, এখানেও তাই। সীমান্তবাঙলায় কাঠি নাচের সঙ্গে যে গান গাওয়া হয় সেই গানকে বলা হয় ঝুমুর। ঝুমুর জঙ্গলমহলের মানুষের প্রাণ।

'শবরচরিত' লোধা শবরদের জীবনচরিত। তাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির পরিচয়বাহী চাঙনাচ ও পাতানাচের আসরে একটি সুন্দর গান উঠে এসেছে -

"মনে করু মনস্তাপ
আর দিমু নাকি জড়েই ঝাঁপ,
ঝাঁপ দিয়ে ডুবিঞে মরিমু গ,
কেমনে লদী পাইরাঁই যামু
খাইছি রে বঁধু গাঁজার কলি
পথে যাতে ঢুলিয়ে পড়ি,
ঢুলিয়ে পড়িছে শ্যামর গায়
ঢুলিয়ে পড়িছে বঁধার গায়
তবুও বঁধা ফিরে না চায়।"[৬]

বঙ্গভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন পরিবেশ-প্রতিবেশের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ধরনের লোকসংগীতের জন্ম এবং পরিপুষ্টি। লোকসঙ্গীতের প্রচার এবং প্রসার বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে লোকসংগীত নিজস্ব অঞ্চলেই দ্যুতিমান হয়ে ওঠে। জন-বিন্যাস, ভূমি-বিন্যাস, এবং ভাষা ও জাতিগত একাত্মতাই লোকসংগীতের অঞ্চল সৃষ্টি করে এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবিচ্ছিন্নতাই লোকসংগীতের পরিপোষক হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত, নলিনী বেরা তাঁর উপন্যাসে যে লোক সংগীত গুলি ব্যবহার করেছেন তার সীমান্ত বাংলার লোকসংগীত রূপে পরিচিত। যেমন, টুসু, ভাদু, করম, বাঁধনা, প্রভতি উৎসবে এই লোকসংগীত গীত হয় ।

'শবরচরিত' উপন্যাসের লৌকিক উপাদান অনুসন্ধানের পূর্বে লোধা শবর জাতির সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ, বসবাস, কুসংস্কার, প্রথা, সামগ্রিক জীবনযাপন জানা দরকার। কারণ সমগ্র উপন্যাসে শবর জাতির ইতিহাস কিভাবে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তা খুব সুন্দর ভাবে তাঁর ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসে দেখিয়েছেন। লোধা ও শবররা পিতৃতান্ত্রিক। সমাজের প্রাথমিক ও মূল সংস্থা হল পরিবার। নিজ নিজ গোত্র দেবতাকে লোধারা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য করেন। লোধা শবরদের সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে মুখিয়া মণ্ডলীরাই সক্রিয় ভূমিকা আছে। এই মন্ডলীর সমস্ত কর্মকর্তা ও সদস্যই পুরুষ। একুশা, সাধভক্ষন, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কর্মে নারীদের প্রাধান্য থাকে। শ্রাদ্ধাদি কর্মে ও পূজা পার্বনে পুরুষদের প্রাধান্য থাকে। তবে নারীরাও অংশগ্রহণ করেন। পুরুষহীন পরিবারে মুখাগ্নি ও শ্রাদ্ধদান নারীরা করে থাকেন। সংসার পরিচালনার মুখ্য দায়দায়িত্ব মহিলাগন পালন করেন। প্রাচীনদের মতে জগন্নাথ, শিব, দুর্গা, চণ্ডী, কালী প্রভৃতি যেসব দেবদেবী বর্ণহিন্দুরা এখন পূজা অর্চনা করেন, সে সকল দেবদেবীর শবরাই আদি পূজক ছিলেন। কালক্রমে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিজেদের শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করার মানসে শবরদের দেবদেবী দের অধিগ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীকালে শবরদের শক্তি যখন ক্ষীণ হয়ে আসে তখন শক্তিশালী বর্ণহিন্দুদের উৎপীড়নে তাঁদের আরাধ্য দেবদেবীর পূজা অর্চনা বন্ধ করে দিতে হয়। শুধু মানুষের উপর নয়, আরাধ্য দেবদেবীর উপর তারা ক্ষুব্ধ হয়ে কয়েকটি দেবদেবীর পূজা অর্চনা বন্ধ করেছেন। লোধা শবরগণ নিজেদের উঁচু শ্রেণীর হিন্দু বলে পরিচয় দেন। এঁরা অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাসী মানবগোষ্ঠী। তাই এঁদের সমাজজীবনে বহু দেবদেবী ও ভূতপ্রেতের কার্যকলাপ দেখতে পাওয়া যায়। 'কালুয়াষাঁড়' ইনি লোধা শবরদের এক অত্যন্ত শক্তিশালী বনদেবতা। মা 'শীতলা' লোধা-শবরদের প্রধান দেবীর অন্যতম। গরাম থানে তাঁর পূজা হয়। তিনি বসন্তবুড়ি, আবার কোথাও কোথাও ঠাকুরাণী বুড়ি নামে পূজা পান। এছাড়াও গুপ্তমনি, বসুমাতা, ধরমদেবতা বা ধর্মঠাকুর, পবনবীর, জুগনী, যোগিনী, মনসা, করমপূজা, টুসু, দেবদেবী আরাধনা করেন বিভিন্ন 'লোকাচারের' মধ্য দিয়ে।

বনাঞ্চলে অধিকতর দরিদ্র লোধারা ছোট কুঁড়ে ঘরে বসবাস করেন। প্রায় ছয় ফুট চওড়ার আয়তাকার দুচালা কুঁড়ে ঘরগুলি গাছের ডাল বা বাঁশ দ্বারা নির্মিত হয়। কাঠামোটি বাধা হয় লতা বা বাবুই দড়ির সাহায্যে। বুনো ঘাস, খেজুরপাতা বা খড় সংযোগে ছাউনির কাজ করেন। পরে ছাউনির চাল পর্যন্ত তিন চার ফুট উঁচু করে মাটির দেওয়াল বা ছিটে বেড়া দেওয়া হয় দুই দিকে। বাকী চওড়ার দুই দিকে দেওয়াল বা ছিটে বেড়া দেওয়া হয় 'মুধুন' অবধি। মুধুন হল ঘরের দুটি চালের সংযোগকারী শক্ত কাঠের দণ্ড। রান্নার কাজে লোধারা মাটির হাঁড়ি ও মাটির খাপরি/সরা প্রভৃতি ব্যবহার করেন। জল রাখার জন্য মাটির কলসি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে অনেকে এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি ও লোহার কড়াই ব্যবহার করা শুরু করেছেন। তাঁরা লবণ রাখেন আয়তাকার গর্ত করা কাঠের খুপুরিতে বাঁশের ফাঁপা চোঙ্গাতেও অনেকে লবণ রাখেন।

খাওয়ার পাত্র হিসেবে এলুমিনিয়ামের জাম, বাটি, থালা, গ্লাস ব্যবহার করেন। কৃষিকাজের জন্য তাঁরা লাঙ্গল, মই, কোদাল, কাস্তে বা দা খন্তা, সাবল, সেচের জন্য তেঁড়া বা ডোঙ্গা, বালতি প্রভৃতি ব্যবহার করেন। লাঙ্গলের অংশ হলো হাল ও জোয়াল। শিকারের যন্ত্রপাতি তীর ধনুক, ফাঁদ/ফাঁস, ক্যাঁচা, গণহাকাঁটা, ছুরি, আঠা, চোঙ্গা, টাঙি, বল্লম প্রভৃতি হল শিকারের যন্ত্রপাতি।

চাং বা বাইকুন্ডোল হল তাঁদের একমাত্র নিজেদের জাতির বাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্র স্থানীয় কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত নাই। চার ইঞ্চি চওড়া কাঠের বৃত্তাকার যন্ত্রটির এক পাশে ছাগল বা গোসাপের চামড়ার ছাওয়া থাকে। কাঠের কুণ্ডলীতে গুচ্ছ গুচ্ছ ঘুঙুর বা টিনের চাকতির গুচ্ছ তার দিয়ে আটকানো থাকে। বাজনা বাজানোর সময় হাতের চাপড়ে বাই কুন্ডলীর এক মধুর ধনী ওঠে। বৃত্তাকারে পুরুষরা তা বাজান এবং নারী পুরুষ সকলে নৃত্যগীতের মাধ্যমে মেতে ওঠেন। পূজা পার্বনে এবং আনন্দ উৎসবে তাঁরা চাঙের নাচ গান করেন। মাদোল এবং ঢোল তাঁরা নৃত্য গীতের সময় ব্যবহার করেন। পাঁতানাচ ও ঝুমুর নাচের সময় এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার হয়।

নলিনী বেরা তাঁর 'শবরচরিত' উপন্যাসে দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোক উৎসব গমহা পূর্ণিমা, বাঁদনা পরব, বড়াম পূজা, চাঙুনাচ, টুসু পরব, পাতানাচ, উৎসবের বর্ণনা করেছেন যা তাঁর উপন্যাসে উপাদান হিসেবে স্থান পেয়েছে এবং ওই অঞ্চলে বসবাস কারী মানুষের আচার-আচরন, সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাসে। এই লোকসংস্কৃতির লোকজ উপাদান গুলি উঠে এসেছে বিচ্ছিন্ন ভাবে নয় মানুষগুলির সঙ্গে নিবিড় ভাবে মিশে উৎসব গুলিকে বাদ দিলে মানুষগুলির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে। দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের জনপ্রিয় উৎসব বাঁদানা। গ্রামীণ শ্রম জীবনের শ্রেষ্ঠতম শরিক গাই-বলদ। সারা বছর যারা মাঠে মাঠে খেটেছে, সম্বৎসর যাদের মানুষ প্রহার করেছে, যাদের থেকে পাওয়া গেছে পুষ্টিকর দুধ, গোবর সার আর জ্বালানি ঘুঁটে। আজ তাদেরই প্রণাম করবার দিন। শিং-এ মাখানো হবে তেল-সিঁদুর, মাথায় পরানো হবে ধানের মুকুট। কাত্তিক অমাবস্যায় আজ গবাদি পশুর আনন্দ অভিষেক ঘটবে। মাদলের তালে তালে সুকণ্ঠ সংগীতে গীত হবে গোরু জাগানোর গান। উপন্যাসে দেখা যায় কামার-কুঁভার-ভূঁইয়া-ভূমিজ মাহাতোরা বাঁদানা পরব নিয়ে মেতে থাকেন। পৌষ সংক্রান্তির মকর পরবে টুসু পূজার লোধা রমনীকূল সকলেই মেতে উঠেন। বলতে গেলে অগ্রহায়ণ মাস থেকে ধানের শীষে পাক ধরলেই টুসু উৎসবের মহড়া শুরু হয়ে যায়। মকর যত ঘনিয়ে আসে উৎসবের আগমনীতে রমণীকূলের মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে। কাজের মাঠে, হাটের পথে ও সন্ধ্যাবেলা মহিলা কূল টুসু সঙ্গীতে মুখর হয়ে ওঠেন। নিরক্ষর মহিলাগণ নিজেদের জীবনের দুঃখ, বেদনা, অভাব, অনটন প্রেম প্রকাশে পলকে ছড়া তৈরি করে সুর দিয়ে টুসু সঙ্গীতে পরিণত করেন। সেই সকল শত সহস্র লোকায়ত টুসু গীত গেয়ে তাঁরা টুসু পরব উদযাপন করেন। সুবর্ণরেখার কালাজলে টুসু ভাসিয়ে ভাসন্ত টুসুকে দেখে জিতেনের ফুফুও গেয়েছিল –

"জলে জলে যায়ো টুসু।
জলে তুমার কে আছে?
গো জলে তুমার কে আছে?
মা-বাপ ছাড়া সবাই আছে গো
জলে শশুর ঘর আছে।"[৭]

নলিনী বেরা সমগ্র উপন্যাসে টুসুগান ব্যবহার করেছেন। লোধা-শবর মহিলা গণ নিজেদের জীবনের দুঃখ, বেদনা, অভাব, অনটন প্রেম প্রকাশের জন্য টুসু গীত গায়।

বাংলার লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সম্পদ হল ছড়া। ছড়া সংস্কৃত 'ছটা' শব্দ থেকে এসেছে। 'শবরচরিত' উপন্যাসে বাক্‌কেন্দ্রিক সংস্কৃতির পরিচয়বাহী বেশ কিছু ছড়া ব্যবহার হয়েছে। লাফিয়ে ওঠে পূর্ণ ছড়া ধরল—

"উবুর ডুবুর পানমৌরি
হিচকা নাচন ঘরচৌরী
সারীরে শুয়া,
কাকের পেটে গুয়া
ড্যাংরা কাকে বলে গেছে।
-গাছে, না পেটে?"[৮]

মুখে মুখে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত হয়, তাহা কালক্রমে লিখিত সাহিত্যের মধ্যেও প্রবেশ করে, কিন্তু লিখিত সাহিত্যের মধ্যে যখন তাহা স্থান লাভ করে, তখন সাহিত্যের প্রয়োজনে ইহার মৌখিকরূপ অনেক ক্ষেত্রেই এমন কি সর্বক্ষেত্রে বললেই চলে, কিছু কিছু পরিবর্তন লাভ করে, কিন্তু ইহার মূল ভাবের কোন ব্যতিক্রম হয় না।

'শবরচরিত' উপন্যাসেও ঔপন্যাসিক 'আমে ধান তেঁতুলে বান',[৯] 'উশাস মাটি-এ বিলেই হাগে?',[১০] 'হীরার ব্যাটা হীরা, উদ্ খাইতে খুদ নাই কলমিশাকে জিরা',[১১] 'মুষা ধান খায় কুটুর কুটুর নেজটি করে ছুটুর পুটুর'[১২] প্রভৃতি প্রবাদের বহুল ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও- 'উপোরনু পড়ল দুম।/ দুম বলে মোর পদঁ সুঙ' (পাকা তাল),[১৩] 'উলুক বুড়ি মুলুক যায়/ বিনা দোষেই মার খায়' (ধামসা),[১৪] 'কাঁচায় তুলতুল পাকলে সিঁদুর' (হাঁড়ি)[১৫] ইত্যাদি একাধিক ধাঁধার ব্যবহার করেছেন। তাঁর উপন্যাসে বেশ কিছু হেঁয়ালি, ঢক, লোককথা, ব্যবহত করেছেন। হেঁয়ালি ঢকের একটি দৃষ্টান্ত হল –

"ফাসুর ফুসুর বউ মোর সর্বগুনে সোনা।
চাঁইফরকি বউ মোর টুই করে কানা।"[১৬]

যে-বউ ফুসুর-ফুসুর করে স্বামীর কানে কানে কথা বলে, সেই চঞ্চলা ছটফটি বউ আপাত দৃষ্টিতে ভালো, সবদিক থেকেই ভালো, তবে যে কোনদিন ঘর ছেড়ে এমন কী ঘরের 'টুই' ফুটো করেও চলে যেতে পারে। ঘরে-দুয়ারে কলাগাছ, পুবাল দেশের গ্রামগুলো ঘরগুলো যেন কলাগাছ দিয়ে মোড়া। একে তো পাকাবাড়ি, পাকা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ঘরে লোক আছে কি নেই বাহির থেকে দেখা যায় না। তার উপর কলার বন ডাবগাছের মাথা আরোই 'রহস্য' করেছে। উপন্যাসে দেখা যায়, পাকাচাষি অদ্বৈত হেঁয়ালি দিয়ে হাসে-

"আট হাত অন্তরা
এক হাত খাই-
লাগারে কলা গাছ
এ চাষী ভাই।
না কাটো পাত
এতেই কাপড়

এতেই ভাত।"[১৭]

চাষাদের চাষ নিয়ে যেমন অহংকার তেমনি চাষ নিয়ে হেঁয়ালিও বানিয়েছে চমৎকার! পাতা না কাটলে কলার কাঁদিও হবে 'পুরুষ্ট' আর তাতেই ঘুচে যাবে ভাত কাপড়ের কষ্ট।

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী নিরক্ষর কিংবা অলিখিত মানুষেই সংস্কারে বিশ্বাসী কিন্তু এ ধারণা যথার্থ নয়। অজ্ঞানতা অনেক সংস্কারের মূল ঠিকই কিন্তু সব সংস্কারের নয়। আসলে মানুষ বিজ্ঞানে কিংবা প্রযুক্তিবিদ্যার যতই উন্নতি করুক, এমন কিছু ব্যাপার আছে যেক্ষেত্রে সে বড় অসহায়, অনিশ্চয়তার শিকার। নৃতত্ত্ববিদরা অবশ্য সংস্কার সৃষ্টির মূলে সর্বাত্মকদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। কী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য সব দেশেই সব মানব সমাজেই সংস্কারের সাক্ষাৎ মিলে। সাধারণভাবে সংস্কারকে দুটি বিভাগে ভাগ করা যায় – ব্যক্তিগত এবং সমাজগত। লোকসংস্কৃতি বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত অপেক্ষা সংহত সমাজ যে সব সংস্কারে বিশ্বাসী সেগুলি প্রতিই সঠিক গুরুত্ব আরোপ করে।

লেখক নীলুয়ার মধ্য দিয়ে যাদুর কথা বলেছেন-সেই যাদুবিদ্যার খোঁজেই হেতা হোতা দৌড়ে বেড়াচ্ছে নীলুয়া। মকরা স্বীকার করল— শুধু তাদের গ্রামেই নয়, ডহরপুর-শঙ্করীডাঙ্গা-কুকাই গ্রামেও শুকু কোটাল, চুনারাম দিগার, ভঁটল ভক্তার মত কিছু গুণীণ আছে যারা সত্যি সত্যি তুকগুণ আর ম্যাজিক জানে। ভিকা বক্তা জানাল—

> "মরা মেয়েমানুষকে কবর থেকে তুলে জীবন্ত করে ফের মানুষ করতে না পারুক, বাঁকা দিগার তাকে 'চিড়কিণ' ভূত থেকে মেয়ে মানুষের রূপ দিয়ে ঘরে এনে বউয়ের মতোই ঘরের কাজ-কাম করাতে পারে বৈকি। তার জন্য লাগে কটা সামান্য উপাচার-একটা ছুরি, কিছু শালপাতা, যাদু জানা শিশুর মাথার খুলি, একটা কাজললতা, এক প্যাকেট সিঁদুর, কাঠের পিঁড়া একটা।"[১৮]

উপন্যাসে বৃষ্টির জন্য পূজা-পাঠ যুগী নাচ, ব্যাঙের বিয়ে, নাম সংকীর্তন ইত্যাদির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বৈশাখে, চৈত্রে ও জৈষ্ঠ মাসে অনাবৃষ্টি হলে পাপে ধরা ভরে গেলে। খোল-করতাল-মৃদঙ্গ সহযোগে চব্বিশপ্রহর কি অষ্টম প্রহরব্যাপী রাম নাম, হরিনাম সংকীর্তন করে।

অন্ত্যজ মানুষের কণ্ঠে গান কিংবা তাদের মুখে উচ্চারিত ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, প্রভৃতি লোকজ উপাদান গুলি চরিত্রের মূল ভাবসত্যকেই পুষ্টিদান করেছে। সমস্যাগুলি যেমন অন্ত্যজ চরিত্রগুলোর অভ্যন্তর উন্মোচনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে তেমনি বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের আঞ্চলিক জনজীবনের বাস্তব চিত্র উদঘাটনে এই পর্যায়ের সংস্কৃতির ভূমিকাটিও গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্য সূত্র:

১) কর্মকার, লক্ষণ (২০১৯) সৃজন। ঘাটাল: কুশপাতা। পৃ.১১
২) মিদ্যা, দুর্গাদাস (২০২০) আরাত্রিক। কলকাতা: বইমেলা সংখ্যা। পৃ.২৫৭
৩) বেরা, নলিনী। (২০০৫) শবর চরিত। কলকাতা: করুনা প্রকাশনী। পৃ.৫০০
৪) তদেব, (পৃ.১৩)
৫) তদেব, (পৃ.২৪)
৬) তদেব, (পৃ.৮৪)
৭) তদেব, (পৃ.৬১৩)
৮) তদেব, (পৃ.৩৮৪)
৯) তদেব, (পৃ.৪৬৭)
১০) তদেব, (পৃ.৬৭৭)
১১) তদেব, (পৃ.৪০৮)
১২) তদেব, (পৃ.৫৯৯)
১৩) তদেব, (পৃ.৪৬৩)
১৪) তদেব, (পৃ.২৩২)
১৫) তদেব, (পৃ.৬৭৭)
১৬) তদেব, (পৃ.৫৩৯)
১৭) তদেব, (পৃ.৪৮১)
১৮) তদেব, (পৃ.৫৩৩)

সহায়ক গ্রন্থ:

১) চক্রবর্তী,বরুণকুমার (১৮৮৬)। বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।
২) ভট্টাচার্য, দেবীপদ (২০০৩)। উপন্যাসের কথা। কলকাতা দে'জ পাবলিশিং।
৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ (১৩৫৮)। বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান। কলকাতা: ক্যালকাটা পাবলিকেশনস।
৪) ভট্টাচার্য, আশুতোষ (১৯৬২)। বাংলার লোক সাহিত্য। (প্রথমখন্ড)। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস ।
৫) সেন, সুকুমার (১৯৯৩)। ভাষা ইতিবৃত্ত। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
৬) দে, শ্রী সুশীলকুমার (১৩৫২)। বাংলা প্রবাদ। কলকাতা রঞ্জন রঞ্জন পাবলিশিং।
৭) বসাক, সুদেষ্ণা (২০০৭)। বাংলার প্রবাদ। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
৮) অট্র, দাস, লক্ষ্মী (২০১৫)। মেদিনীপুর জেলার লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি। কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী।
৯) ভক্তা, প্রহ্লাদকুমার (২০০৯)। লোধাশবর জাতির সমাজজীবন। মারাংবুরু প্রেস: পূর্ব মেদিনীপুর।